ধারাবাহিক উপন্যাস

(পর্ব ১৩, ১৪ ও ১৫)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-১৩-

আমার বাবাকে তোর মনে আছে? আমজাদের প্রশ্ন।

মনে থাকবেনা কেন? আমাদেরকে কত আদর করতেন।

তোরাতো ওনার বাইরের রূপটা দেখেছিস। উনি শুধু ভাল নয়, কেমন সৎ মানুষ ছিলেন, তা তোদের জানার কথা নয়। বাবা সব সময় পায়ে হেটে অফিসে যেতেন। দুই মাইল পথ। রৌদ্র হোক, বাদলা হোক। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, হাটলে শরীর ভাল থাকে। কিন্তু আমরা জানি, ওটা ছিল তার কৃচ্ছতা সাধনার অঙ্গ। একবার মায়ের একটা অপারেশনের দরকার। কিন্তু বাবার হাতে টাকা নেই। বাবা তখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। একটা লোক বাসায় এলো এক রাতে। কার কাছে শুনেছে, বাবার টাকার দরকার মায়ের অপারেশনের জন্য। এসে মায়ের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করলো । তারপর, বাবাকে কি একটা সার্টিফিকেট দেবার অনুরোধ করে এক বাণ্ডিল টাকা এগিয়ে ধরলো। বাবা লোকটাকে রাগ করে বাসা থেকে বের করে দিলেন। আমার সেই বাবার চাকরী কেন চলে যায় জানিস?

কেন?

ঘুষ খাওয়ার জন্য। হাঃ হাঃ হাঃ। পাগলের মত হেসে উঠে আমজাদ।

কি বললি?

যা ঘটেছে, তাই বললাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার তখন এম, এ ফ্যাইনাল পরীক্ষা চলছে। আট পেপারের মধ্যে চারটা হয়ে গেছে। আমার পরীক্ষা চলছে বলে, মা আমাকে খবরটা দেননি। আমার এক সহপাঠি, আমাদের পাড়ার ছেলে, ওর কাছে শুনলাম, বাবা জেলে। পরীক্ষা মাথায় উঠলো। সেই রাতের ট্রেনে কুমিল্লা

একটা সিগারেট ধরায় আমজাদ। খাবি নাকি একটা? না সূচক মাথা নাড়ায় ইমন।

অনেক ধরাধরি করে বাবার বেইল পাওয়া গেল।

কেইস টা কি ছিল?

বললাম না, ঘুষের কেইস। বাবা লোন দেবেন বলে এক পার্টি থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। সেই পুরোনো ট্রেপ। বাবার অফিসের ড্রয়ারে টাকাটা পাওয়া গেছে। বাবার পার্শনাল ড্রয়ারের চাবি কারু কাছে থাকার কথা নয়। ওখানে যখন টাকাটা পাওয়া গেছে, টাকাটা ওনারই, টাকাটা উনিই নিয়েছেন। এসিট্যান্ট ম্যানেজার সাক্ষী। উনি দেখেছেন, পার্টি টাকাটা দিতে। বছর

খানেক ধরে মামলা চললো। বাবার চার বছর জেল হয়ে গেল। সেই এসিট্যান্ট ম্যানেজার এখন ম্যানেজার। দুটা শপিং মলের মালিক। একটা কাপড়ের মিলের মালিক। বিরাট হোমরা চোমরা।

ইমন ভাই, খাইতে আসেন। দরজার বের থেকে ডাক দেয় জয়নাল।

জয়নাল, ওর খাবার এখানে দিয়ে যাও।

আচ্ছা, আনতাছি। বলে চলে যায় জয়নাল।

আমার কেন জানি সন্দেহ হয়েছিল, টাকাটা বাবা নিতেও পারেন। অভাব, লোভ মানুষকে বদলে দিতেও পারে। রায় হবার আগের দিন রাত্রে আমরা খেতে বসেছি। আমি বাবাকে বললাম, বাবা, ঠিক করে মনে করতো, লোকটা হয়তো টাকা নিয়ে এসেছিল আর তুমি ভুলে টাকাটা ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলে কিনা। বাবা কোন উত্তর দিলেন না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বাবা আর খেতে পারলেন না। ভাতে পানি ঢেলে উঠে গেলেন।

পরদিন রায় হলো। বাবা জেলে চলে গেলেন। সে থেকে আমি খেতে বসলেই বাবার সেই চেহারাটা ভেসে উঠে চোখের উপর।

জেলের সেলে ছয় মাসের মধ্যে মারা গেলেন বাবা, ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। ওনার পকেটে একটা চিরকুট পাওয়া গোলো

চুরি না করেও সমাজের কাছে আমি চোর বলে সাব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমার এ কলঙ্কিত জীবন রেখে লাভ কি?

একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স শূন্য। যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সব মামলার পিছে গেছে। আমি পথে নামলাম। নষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদাবাজ হয়ে গেলাম। আমজাদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো দু হাতের তালুতে মুখ রেখে। আল্লার দুনিয়ায় কোন বিচার নাইরে ইমন। আমরা যারা দূ চার টাকা চাঁদা আদায় করি, হয়ে গেলাম সন্ত্রাসী। আর যারা আমদের সব কিছু লুঠ করে আমাদের পথে বসিয়ে দিল, তারা ভাল মানুষ হয়ে গেল, সমাজের নামী দামী লোক হয়ে গেল। ওদের পুলিশ ধরে না, র‍্যাব ধরে না।

ইমন কিভাবে আমজাদকে শান্তনা দেবে বুঝতে পারেনা।

বাদ দে ওসব কথা। তোর কথা বল। তুই কোথা থেকে এলি? কেন এলি? কি করে আমার খোজ পেলি? থাকবিতো কটা দিন আমার সাথে? এক গাদা প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আমজাদ।

বলবো, সব বলবো। আমি জানিনা, তোর এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে। কেউ বলেনি আমাকে। পরিমল শুধু বলেছে, তুই এম, এ ফাইন্যাল দিসনি। আর কিছু বলতে পারলো না। আমি

অষ্ট্রেলিয়া থাকি এখন। কুমিল্লা এসেছি শুধু এক রাতের জন্য। কাল আমাকে ফিরতে হবে। তোকে আমার ঠিকানা দিয়ে যাবো। যোগাযোগ করিস। প্রমিজ, এ নরক থেকে তোকে আমি উদ্ধার করবই।

প্লেট আর বাটিতে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে জয়নাল। নিঃশব্দে সেগুলো রেখে বেরিয়ে যায় সে।

কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারেনারে হাবা। সবাই নিজ নিজ অদৃশ্যের ঘুরপাকে ঘুরে বেড়ায়।

তুই আমার হাবা নামটা এখনো মনে রেখেছিস দেখছি, আমি তো নামটা নিজেই ভুলে গিয়েছি।

সীমাকে দেখেছিস? অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় আমজাদ।

সীমা? কোন সীমা?

কেন, জয়নাল সীমার সাথে তোর পরিচয় করিয়ে দেয়নি? আমার মোটর সাইকেলটাতো ওদের বাসাতেই থাকে।

হ্যাঁ, যে বাসায় জয়নাল মোটর সাইকেল নিতে গিয়েছিল, সেখানে একজন সন্তানসম্ভবা মহিলাকে দেখেছি বটে।

সেই সীমা। জেলা হাসপাতালের ডাক্তার ছিল। কেন যে আমার মত অপদার্থের সাথে জড়িয়ে নিজের জীবনটা শেষ করে দিল।

তুই এসব ছেড়ে দে পিন্টু।

সীমাও বলে ছেড়ে দিতে। ওকে কথা দিয়েছি, সব ছেড়ে দেব। কিন্তু ছাড়ব বললেই কি ছাড়া যায়? বড় বড় রাঘব বোয়ালরা, যারা আমাদের ব্যাবহার করেছে, তাদের কড়া হুকুম, ওসব চিন্তা যেন মাথায় না ঢুকাই। ওদের ভয়, আমি পুলিশের কাছে ধরা দিলে ওদের কীর্তিকলাপ সব ফাঁস হয়ে যাবে। ওরা যদি টের পায়, আমি ধরা দিতে যাচ্ছি, পুলিশের কাছে যাবার আগে ওরা আমাকে শেষ করে দেবে। তবু আমি যাব, সীমার জন্য যাব। আমার সন্তানের জন্য যাব। আমি সীমাকে কথা দিয়েছি। তূই এসেছিস ভালই হয়েছে। তোর কাছে একটা অনুরোধ, রাখবি?

রাখব।

কাল থানায় যাবি। বলবি, পিন্টু ধরা দেবে। কি, আমার এ কথাটা রাখবি না?

অবশ্যই রাখবো। তোর এ সামান্য কাজে লাগতে পারলে তোর বন্ধু হলাম কেন?

তুই বাঁচালি আমাকে। মনটা হালকা হলো। হাতটা ধুয়ে খেতে শুরু কর। খেতে খেতে তোর কথা বল। এতদিন পর কুমিল্লা এলি কি করতে?

এসেছি বিয়ে করতে? উঠতে উঠতে বলে ইমন।

কি বললি? লাফ দিয়ে উঠে ইমনকে জড়িয়ে ধরে আমজাদ। কোথায়? কবে?

কাল। তোদের কুমিল্লার মেয়ে। মেয়েটার নাম রুমকি। আমার পছন্দ। তবে সে আমাকে পছন্দ করে কিনা এখনো জানিনা। কাল সকালে ওদের বাড়ী যাব। সে যদি আমাকে পছন্দ করে, কালই বাবা মাকে বলবো, কাজী ডেকে বিয়েটা পড়িয়ে দিতে। হো হো করে হেসে উঠে ইমন।

পানির জগটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে ইমন।

পাগলা, তুই এখনো পাগলাই রয়ে গেলি। এমন করে কি বিয়ে হয়?

হয় রে, অবশ্যই হয়। আমকে রবিবার দুপুরের প্লেনে ফিরতে হবে। যাদের হাতে সময় থাকেনা, ওদের বিয়ে এমনি করেই হয়। আমার এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল এয়ারপোর্টে।

তাই বলে আমি থাকতে তোর বিয়ে অমন করে হবে? ছুটি নিয়ে আয়। আমি সব ব্যাবস্থা করবো। আমি জেলে থাকলে কি হবে, আমার লোক জনের অভাব নেই। কুমিল্লা শহর কাঁপিয়ে দেবে। নে, খাওয়া শুরু কর। কি হাবি জাবি দিয়েছে, কে জানে। তুই এমন সময় এলি।

ইমন প্লেটটা হাতে নিয়ে মোড়ায় বসে। ভাতের পাশে একটা ডিম আর দু পিস আলু। তার পাশে একটু শাক। একটা বাটিতে ডাল। ইমন বাটি থেকে ডাল নিয়ে ভাত মাখায় শাকের সাথে।

তুই আসবিনা আমার বিয়েতে?

আমার মাথার উপর অনেক বড় বিপদ রে হাবা। বেরুলেই ক্রশফায়ারে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তবু আমি যাব। যেমন করেই হোক, যাব। তোর বিয়ে, আর আমি যাবনা, এটা কি করে হয়। মেয়েটার সাথে দেখা হলো কি করে।

ইমন একটা লোকমা করে ভাত মুখে দেয়। মেয়েটা আমার বোনের বান্ধবীর বড় ....

কথা শেষ করতে পারলোনা ইমন। দরজার কাছে ছুটে এসে ফিস ফিস করে উঠল জয়নাল,

ওস্তাদ, সর্বনাশ। পুলিশ আইতাছে।

মুখের ভাতটা গলায় আটকে যায় ইমনের।

-১৪-

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয় আমজাদ। এক রাশ অন্ধকারের মধ্যে তিনটি প্রানী বসে।

জয়নাল, তুই ওদের দেখলি কি করে? ফিস ফিস করে বলে আমজাদ।

খাওনের পর পেসাব করতে বাইরে গেছি। ভাবলাম, একটা চক্কর মাইরা দেখি, হাল হকিকত কি। বড় রাস্তার মোড়ের কাছাকাছি যাইয়া দেখি, বড় রাস্তায় খাড়াইয়া আছে একখান মোটর সাইকেল আর একটা জীপ। আর একখান মোটর সাইকেল কাঁচা রাস্তায় নামতাছে।

ওরা নাও তো হতে পারে। তুই ভুল দেখেছিস।

না ওস্তাদ, না। একজনের কাঁধের রাইফেলটা ঠিক চোখে পড়ল। চান্দের আলোয় চক চক করতাছে।

তুই ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাক। কোন সাড়া শব্দ করবিনা। আকবর কই? আলো নিভিয়ে দিস।

আকবর ভাই হেই ঘরে। বাত্তি নিভাইয়া দিছি। যেতে যেতে বলে জয়নাল।

তুই পালা ইমন। আমি ধরা দেব। এ লুকোচুরির জীবনে আমার ক্লান্তি ধরে গেছে। এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল। একটা দুঃখ থেকে গেল, সন্তানটার মুখ দেখে যেতে পারলাম না। তোর বিয়েতে হয়তো আর যেতে পারব না। তবু চেষ্টা করে দেখব। যদি ওরা দয়া করে যেতে দেয়। ইমনের দিকে তাকিয়ে বলে আমজাদ।

ইমনের মুখ ভয়ে রক্তশূন্য। ওর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়না।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বের হয় আমজাদ। ওর দৃষ্টি ঘরের চার পাশ ঘুরে আসে। চাঁদের ক্ষীন আলোয় সব কিছুকে গভীর ভাবে অবলোকন করে, বিড়ালের মত নিঃশব্দে আবার ঘরে ফিরে আসে সে।

হাবা।

উঁ।

ভয় পাসনা। ওরা এসেছে আমার জন্য। মুশকিল হলো, আমার সাথে তোকে পেলে তোকেও ছাড়বেনা। মারধর করবে। কতদিন আটকে রাখে তার ঠিক ঠিকানা নাই। কাল তোর বিয়ে। পরশু

তোকে ফেরৎ যেতে হবে। তোর ধরা দেওয়া চলবেনা। ভয় পাচ্ছিস?

না। কথাটা জড়িয়ে যায় ইমনের।

ভয়ের কিছু নেই। আমাকে পেলে ওরা আর অন্য দিকে নজর দেবেনা। দেখছিস, পেছনে অন্ধকারে ঝোপের মত দেখা যাচ্ছে, ওটা হলো বাঁশ ঝাড়। ওর পেছনে ডোবা। ঘরের পেছনে সব হলো সীম গাছের মাচা। মাচার মাঝখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ডোবাতে গিয়ে কচুরী পানার মধ্যে বসে থাকবি। কপালে কিছু মশার কামড় আছে। কি আর করবি? সকাল হলে চলে যাস। ভয়ের কিছু নেইরে পাগলা। পারবি না?

পারবো। কোন মতে উত্তর দেয় ইমন।

কেন যে এলি এই বিপদের মধ্যে। হাতে সময় নাই। ওরা আসার আগেই তুই পালা। আমি সামনে যাচ্ছি। ওদের নজর থাকবে আমার উপর। যদি বাঁচি, প্রতিজ্ঞা করলাম, ভাল হয়ে যাব। মিডিওকারদের এ পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যত নেই। যারা বেশী খারাপ, ওরাই এ সমাজে শান শওকত নিয়ে টিকে থাকে। যে ভাবেই হোক, তোর ঠিকানা যোগাড় করে তোর সাথে যোগাযোগ করবো। যা, যা তুই। প্রায় ধাক্কা দিয়ে ইমনকে বের করে দেয় আমজাদ। ফি আমান আল্লাহ।

ইমন অন্ধকারে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়। একটু সামনে গিয়ে একটা সীম গাছের মাচার নীচে ঢুকে, হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকে। একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। মায়ের মুখটা মনে পড়ে ওর। মা চেয়েছিলেন, সে যেন মাকে ছেড়ে না আসে। কেন সে মায়ের কথাকে অবহেলা করে এলো? ওর কান্না আসে। আশেপাশে ব্যাঙ ডাকছে। জোনাকী জ্বলছে এখানে সেখানে। মাচার নীচে ভ্যাপসা গরম। ওর মুখটা ঘেমে নেয়ে উঠে।

আমজাদ ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল, দুটো মোটর সাইকেল এসে দাড়াল উঠানের দু কোনে। আরোহীদের কাধে রাইফেল, মেশিনগানও হতে পারে। কি করে খবর পেল ওরা? ইমন কি পুলিশের চর। ছি ছি, কি ভাবছে সে। নিজকে ধিক্কার দেয় আমজাদ। জয়নালের ওকে নিয়ে এখানে আসা ঠিক হয়নি। এখন আর করার কিছু নেই। ওতো ধরা দিতেই চায়। শুধু দুঃখ, মাঝখানে ইমন বেচারা বিপদে পড়লো। না আর দেরী করা যায় না। ইমন এতক্ষনে ডোবায় চলে গেছে হয়তো।

আমজাদ মাথার উপর দু হাত তুলে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। মোটর সাইকেল দুটো দেখা যাচ্ছে উঠানের দু কোনায়। সে দিকে তাকিয়ে, একটা গাছের আড়ালে থেকে, সর্ব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠে আমজাদ,

আমি পিন্টু। আমি সারেণ্ডার করতে চাই।

ওর গলার শব্দ অন্ধকারের বুক চিরে অনেক দুরে ভেসে যায়। কানে পৌছায় ইমনেরও।

কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়।

একটা জীপ তীর বেগে ছুটে আসে কাদা ছিটিয়ে। দুজন সিপাই জীপ থেকে নেমে ছুটে যায় ঘরের পেছন দিকে। দু জন সিপাই মোটর সাইকেল থেকে নেমে, ঘরের সামনের দিকে ম্যাশিনগান তাক করে দাঁড়িয়ে থাকে। জীপের হেড লাইটের আলোয় ঘরের সামনের দিকটা আলোকিত হয়ে উঠে। মেজর মমিন গাড়ীতে বসে মাইক্রোফোনে চিৎকার করে বলেন,

আমরা বাড়ীটা ঘিরে ফেলেছি, পালাবার পথ নেই। সবাই মাথার উপর হাত তুলে সামনে আস। কেউ যেন ঘরে না থাকে। এক জনও না। পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করবো। কুইক।

ইমন মাথা নীচু করে হামাগুড়ি দিয়ে একটা পাট কাঠির বেড়া ঘেষে সামনে আগায়। ওর লক্ষ্য বাঁশ ঝাড়। পায়ের নীচে নরম মাটি। একটা ড্রেনের মত। প্যাক প্যাকে কাদা। অন্ধকরে ড্রেনে পড়ে ওর সারা শরীর, কাপড় চোপড় কাদায় একাকার হয়ে যায়।

সিপাই দু জন সার্চ লাইটের আলো ফেলে এদিক ওদিক। ইমনের মাথার উপর দিয়ে আলো আসা যাওয়া করে কয়েকবার। সে লতাপাতার জঙ্গলের মাঝে মিশে, নিঃশব্দে ড্রেনের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। সিপাইরা ঘরের অন্য পাশে চলে যায় আলো ফেলতে।

আমজাদ মাথার উপর হাত তুলে সামনে এগিয়ে আসে। পেছনে জয়নাল আর আকবর। ভয়ে ওদের মুখ রক্ত শূন্য।

কালো পোষাক পরা দু জন সিপাই ঝাপটে ধরলো আমজাদকে। আরো দু জন পুরো দলটার পেছনে এসে দাঁড়াল।

সোজা গিয়ে জীপে উঠ। কোন ঝামেলা করার চেষ্টা করলে গুলি করবো। মেজর মমিন বলে উঠেন। তার হাতে পিস্তল। আর কেউ ঘরে আছে? প্রশ্ন আমজাদকে।

না, কেউ নেই। উত্তর দেয় আমজাদ। ওর গলা শুনা যায় কি যায় না।

দু জন সিপাই আমজাদকে দু পাশে ধরে জীপে উঠায়। জয়নাল আর আকবর নিজে নিজেই জীপে উঠে।

ওদের থানায় নিয়ে যাও। আমি একটু পরে আসছি। রকীব আর হাশেম থাক আমার সাথে। আমরা ঘর গুলো সার্চ করে দেখি। বাকীরা জিপের সাথে যাও। দরকার হলে ডাকবো। মেজর মমিন সঙ্গীদের নির্দেশ দেন।

ইমন এগুচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে সীমের মাচার নীচ ধরে ধরে। আড়চোখে সে দুরে ঘরের আলো

দেখে। মায়ের মুখ, বাবার মুখ, নীতুর মুখ ভেসে উঠে ওর চোখের উপর। কেন সে এলো। জেনে শুনে সে আমজাদকে বিপদে ফেললো। জয়নাল ওকে বিপদের কথা বলেছে। ওর সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল। ও আসল বলেই আমজাদ ধরা পড়লো। অবশ্য পিন্টুওতো ধরা দিতে চেয়েছে। কিন্তু ধরা দেওয়া আর ধরা পড়ার মধ্যে তফাৎ আছে। ধরা দিলে ওকে হয়তো মার খেতে হতো না। এখন ওরা আমজাদকে মারবে, মেরে হাড় গুড়ো করে ফেলবে। টর্চারে মারা গেলে বলবে, ক্রশফায়ারে মারা গেছে। আল্লা, আমজাদকে রক্ষা করো। মনে মনে প্রার্থনা করে সে।

জীপ চলে যায় মেজর মমিন, দু জন সিপাই আর মোটর সাইকেল দুটো রেখে।

মেজর মমিনের দলটা সার্চ লাইট হাতে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে ঘর গুলো। বাইরের ঘরে রান্নার হাড়ি কুড়ি, বাসন কোসন ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়না। আমজাদের ঘরে একটা বড় ছোরা আর একটা পিস্তল পাওয়া যায়। ইমনের অসমাপ্ত ভাতের থালায় রাগে একটা বুটের লাথি ছুড়ে দেন মেজর মমিন।

সামনে একটা খড়ের স্তুপ। ইমন সেখানে এসে থামে। এখান থেকে বাঁশ ঝাড় শুরু। পেছনেই কচুরী পানায় ভর্তি ডোবা। ওর ঘাম ঝরছে দর দর করে। তৃষ্ণায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সামনে একটু ফাঁকা যায়গা। তার পরই বাঁশ ঝাড়।

আর কেউ নাই স্যার। বলে উঠে হাশেম।

ভাল করে দেখছ?

দেখছি স্যার। জবাব দেয় রকীব আর হাশেম, দু জনেই।

মনে হয় ফেরৎ যাওয়া যায়। সায় দেন মেজর মমিন।

হঠাৎ এক ঝলক বিশ্বাসের আলো ঝিলিক দিয়ে যায় ইমনের মনের মধ্যে। অনেক দুর চলে এসেছে সে। ও দিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। ওরা বোধ হয় চলে গেছে। অবশ্য এত দুর থেকে ঘরের সাড়া শব্দ পাওয়ার কথা নয়। ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে বটে। হয়তো ওরা আলো জ্বালিয়েই চলে ঘেছে।

বাঁশের ঝাড় পার হয়ে ডোবা, আর একটুখানি পথ। তারপর ডোবাটায় নেমে কচুরীপানার মধ্যে বসে থাকা।

পারবে, সে অবশ্যই পার হতে পারবে। ওকে পারতেই হবে। রুমকির মুখটা ভেসে উঠে ওর চোখের সামনে।

-১৫-

তরিকুল আলম সাহেব বড় খোশ মেজাজে আছেন। এত দিন পর ছেলের সাথে দেখা হবে। রাতে তার ঠিকমত ঘুম হয়নি। রাঙামাটি থেকে রাতের বেলাই চট্টগ্রাম চলে এসেছেন। ইচ্ছা ছিল, চট্টগ্রাম না থেমে রাতের বেলাই কুমিল্লা রওয়ানা হবেন। কিন্তু পৌঁছাতে পৌঁছাতে আনেক রাত হয়ে যাবে আর অত রাতে ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে, এ দু কারনে ইচ্ছাটাকে চেপে রেখেছেন তিনি। ফজরের নামাজ পড়ে তার আর অপেক্ষা করার ধৈর্য্য ছিলানা। ড্রাইভার এনায়েতকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, চল, দুপর বারটার আগে ঢাকা পৌঁছাতে হবে।

এনায়েত ঝড়ের বেগে জীপ চালিয়ে সকাল আটটার আগেই ফেনীর কাছাকাছি এসে গেল।

এনায়েত, একটা রেষ্টুরেন্ট দেখে গাড়ী থামাও। নাস্তা করতে হবে। ড্রাইভারকে হুকুম দেন তকিকুল আলম সাহেব।

রেষ্ট হাউজে ন যাইবেন ছার?

না, ওখানে গেলে দেরী হয়ে যাবে।

এনায়েত বিশ্ব রোডের পাশে একটা রেষ্টুরেন্ট দেখে গাড়ী থামাল। আরো কয়েকটা বাস, কার থেমেছে সেখানে। মোটামুটি ভালই ব্যাবসা করছে রেষ্টুরেন্টটা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুন্দর পরিবেশ।

চা আর বিস্কুট দিয়ে নাস্তা সেরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন তরিকুল আলম। প্লেটে চা ঢেলে তাড়াতাড়ি শেষ করে পিছু নিল এনায়েত।

গাড়ী চলছে কুমিল্লার পথে।

এনায়েত গাড়ি চালাচ্ছে। তরিকুল আলম সাহেবের অফিসের জীপ। ওনার দায়িত্বেই জীপটা থাকে। এটা নিয়ে মাসে দু একবার ওনার রাঙামাটি আসাযাওয়া করতে হয় অফিসের কাজে। গাড়ীতে বসে বসে ভাবছেন তিনি। কেমন করে দেখতে দেখতে ইমন বড় হয়ে গেল। ছোট কালে টনসিলে ভুগত খুব। লেখাপড়ায় ছিল মোটামুটি। খেলাধুলার ধারে কাছেও যেতো না। বেশ চুপচাপ ছিল। তবে দুষ্ট বুদ্ধি ছিল বেশ। নীতুকে জ্বালাতো খুব। ওর জিনিষপত্র লুকিয়ে রাখতো। নিজে কোন কিছু নষ্ট করে নীতুর দোষ দিত। ভাগ্য ভাল, তিনি কুমিল্লা ছেড়েছিলেন। ঢাকা এসে ইমনের সব বদলে গেল। লেখাপড়ায় উন্নতি হলো। স্বাস্থ্য ভাল হল। দুষ্টুমিটা পুরোপুরি না গেলেও, কিছুটা কমলো।

এনায়েত, থাই লিচুর প্যাকেটটা কি গাড়ীতে উঠিয়েছিলে।

এ নিয়ে তিন বার প্রশ্নটা তিনি করেছেন এনায়েতকে।

জি ছার, উডাইয়ি। ছোড সাবের লাই কত পেরেশানি করি ফলগুন পাইড়য়ি। আঁই ফ-অল অইনি যে, ফলগুন রাখি আইস্যুম?

গাড়ী চলছে। তরিকুল আলম ভাবছেন। থাইল্যান্ড থেকে বীজটা এসেছিল আর লিচুর মত দেখতে বলে, রাম্বুথানকে স্থানীয় লোকরা বলে, থাই লিচু। বন বিভাগ থেকে রাঙ্গামাটিতে চাষ হয়েছে ফলটার। ফল হবার বয়স হবার পরও গাছগুলো ফল দিচ্ছিলনা। তরিকুল আলম থাই বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে, রাত দিন খেটে গবেষনা করে নতুন ধরনের সার উদ্ভাবন করেছেন। তা ব্যাবহার করার পর গত বছর থেকে গাছগুলোতে ফল দিচ্ছে। ফল এখনো পাকেনি। তবুও ছেলেকে দেখাবার জন্য কয়েকটা নিয়ে যাচ্ছেন।

ক.. ত .. দি .. ন ছেলেকে দেখেননি তিনি। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো তার। চেহারা কি বদলে গেছে ওর। তবে একটা জিনিষ ভাল লেগেছে তরিকুল আলম সাহেবের। ইমনের কথায় আগের মত মিনমিনে ভাবটা নেই।

সময় যেন কাটছেনা। এনায়েতকে কত ধমক দিতেন, জোরে গাড়ী চালায় বলে। কিন্তু আজ ননে হচ্ছে, এনায়েত উল্টো আস্তে গাড়ী চালাচ্ছে।

আর কতক্ষন লাগবে এনায়েত।

চলি আইস্যি ছার। আর দেরী ন লা ..ই ..বো।

কুমিল্লার কাছাকাছি এসে গাড়ীর জ্যামে পড়ে গেল ওরা। ট্রাকের বহর কুমিল্লা ঢুকছে। বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল তরিকুল আলম সাহেবের। আজ সকাল থেকে দু বার ইমনের মোবাইলে ফোন করেছেন তিনি। দু বারই ফোন অফ পেয়েছেন। ছেলেটা বোধ হয় ফোন অফ করে ঘুমাচ্ছে। কতদিন অবসর পায়নি। দেশে এসে একটু শান্তির বিশ্রাম। ঘুমাক, ছেলেটা ঘুমাক। ফোন করতে গিয়ে ফোন হাতে নিয়েও, সেটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখেন তিনি। একটু পর তো দেখা হচ্ছেই।

ছার, কডে যাইয়ুম? রিষ্ট আউজে নি? কুমিল্লা ঢুকতে ঢুকতে এনায়েত প্রশ্ন করে তরিকুল আলম সাহেব কে।

তোমাকে তো বলাই আছে। যাও যাও, রেষ্ট হাউজে যাও। তরিকুল আলম সাহেবের কন্ঠে অধীরতা।

সাড়ে নটার দিকে তরিকুল আলম সাহেব কুমিল্লা বন বিভাগের রেষ্ট হাউজে পৌছে দেখেন,

বারান্দায় জমজমাট আড্ডা বসেছে। আড্ডার মধ্যমনি বন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর গোলাম কবীর সাহেব। উনি আজ সকালে অফিসের কাজে কুমিল্লা এসেছেন। সাথে স্থানীয় দু জন অফিসার আছেন - ইকবাল হোসেন আর সোবাহান খান।

গোলাম কবীর সাহেব তরিকুল আলম কে দেখে বলে উঠলেন, আরে আলম সাহেব, আপনি কোত্থেকে?

স্যার, রাঙ্গামাটি থেকে ফিরছি। কেমন আছেন স্যার?

ভাল। একটু ফ্রেশ হয়ে আসুন। আমি নাস্তা দিতে বলছি। দবির, স্যারের জন্য নাস্তা দিতে বল। আর আমাকে আরেক কাপ চা দিতে বল।

না না, অস্থির হবেন না স্যার। আমি ফেণীতে নাস্তা করে এসেছি। দবির, আমার ছেলে কি ঘুম থেকে উঠেছে? প্রশ্নটা কেয়ারটেকার দবিরকে।

স্যার, ভাইয়া ত কালকে রাতে আর ফিরে নাই। ব্যাগটা রুমে রাইখ্যা যে গেল, আর দেখা নাই। কইল, কোন বন্ধুর সাথে দেখা করবো।

তরিকুল আলমের সাহেবের মুখে এক খন্ড উৎকন্ঠার মেঘ জমে উঠে। কি বলছ দবির?

আপনার ছেলে না অষ্ট্রেলিয়া থাকে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন গোলাম কবীর।

হ্যাঁ স্যার। এসেছে পরশু। গত কাল বিকালে কুমিল্লা এসেছে কোন বন্ধুর সাথে দেখা করতে।

চিন্তা করবেন না। বন্ধুর সাথে বহুদিন পর দেখা। তাই বোধ হয় আসতে দেয় নাই। অভয় দেন গোলাম কবীর।

ওর ত আমার সাথে ঢাকা ফেরৎ যাবার কথা।

তা হলে এখনি এসে যাবে। আপনি নাস্তা খেতে খেতেই হয়তো এসে যাবে।

তরিকুল আলমের সাহেবের উৎকন্ঠা আর যায় না। তিনি মোবাইলের বোতাম টিপতে শুরু করেন। রিং হচ্ছে না। মোবাইল সুইসড অফ। ওনার মুখে চিন্তার মেঘ আরো গভীর হয়।

বাবুর্চী নাস্তা রেখে গেল।

স্যার, আসেন স্যার। দবির ডাকছে।

অনিচ্ছা সত্বেও তরিকুল আলমের সাহেব হাত ধুয়ে খেতে বসলেন। ছেলেটা কোথায় গেল, কি করছে, কখন আসবে, কখন তিনি ঢাকা যাবেন?

দবির, ইমন কোথায় গেছে, কিছু বলে গেছে?

না স্যার। উনি আইসা ব্যাগটা রাইখ্যাই চইলা গেলেন। কোন কথাই জিজ্ঞাস করার সুযোগ পাইলাম না। চইলা আইবো স্যার, চিন্তা কইরেন না। দবিরের উত্তর।

চলে আসবে, ঠিক সময়মতই চলে আসবে। ও তো আগের মত কচি খোকা নেই। দেশ বিদেশ ঘুরেছে। গোলাম কবীর সাহেব বলেন।

স্যার, একটা সু খবর শুনেছেন? ইকবাল হোসেন বলে উঠেন কথার মাঝখানে। র‍্যাবের হাতে, গত রাত্রে কুমিল্লার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী পিন্টু ধরা পড়েছে।

হ্যাঁ, স্থানীয় কাগজে দেখলাম। ঢাকাতেও তিন চারজন ধরা পড়েছে। গোলাম কবীর সাহেব বলে উঠেন।

র‍্যাব একটা আল্লার রহমত স্যার। সন্ত্রাসীদের জ্বালায় ঘর থেকে বের হবার উপায় ছিল না। ওরা আসবার পর দেখেন, অবস্থা কেমন পাল্টে গেছে। বলেন তরিকুল আলম।

ঠিক বলেছেন। সায় দেন গোলাম কবীর। সন্ত্রাসীদের ভয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিরাপদ ছিলনা, লোক জনের বাজার ঘাটে যাবার উপায় ছিলনা। ব্যাবসায়ীরা ওদের জ্বালায় অস্থির হয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলা ঢাকাকে মনে হত, মৃত নগরী। খোদার রহমতে র‍্যাব আসার পর অবস্থা বদলে গেছে। রাস্তা ঘাটে মানুষ নির্ভয়ে চলা ফেরা করতে পারছে।

কিন্তু স্যার, শুনা যাচ্ছে, র‍্যাবের হাতে বিনা বিচারও নাকি কেউ কেউ মারা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, ক্রসফায়ারে মারা গেছে। বিচার না করেই শাস্তি। দোষী না নির্দোষ, না জেনে শাস্তি। এটা ঠিক না স্যার। এবার যোগ দেন সোবাহান খান।

ক্যান্সার সারাতে গেলে দু একটা ভাল সেলও নষ্ট হবে, উপায় নেই। বলেন তরিকুল আলম।

আপনি আমি সহজেই সে কথা বলতে পারি। কিন্তু যারা নিজেদের নির্দোষ সন্তানদের হারিয়েছে, তাদের কথা একবার ভেবে দেখুন। সোবাহান খান পিছু হটেন না।

যারা ক্রসফায়ারে মারা গেছে ওরা যে পুরাপুরি নির্দোষ, এ ব্যাপারে আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না সোবাহান সাহেব। তরিকুল আলম সাহেবও হার মানতে রাজী নন। খোঁজ নিয়ে দেখুন, তারা হয় সন্ত্রাসী, না হয় সন্ত্রাসীদের সহযোগী। না হলে ওদেরকে সন্ত্রাসীদের আস্তানায় পাওয়া যাবে কেন?

চলবে ...